দৈনিক বাংলা

031

তারিখ 11 JUL 1988 পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

নকল ধরা পড়ছে বস্তায় বস্তায়

পরীক্ষা আরম্ভের আগে পরীক্ষার্থীদের জামা-কাপড় থেকে যে চিরকুট ও বইয়ের পাতা উদ্ধার করা হয়েছে, তার পরিমাণ দুই বস্তা। ব্যাপারটি মাত্র একটি কেন্দ্রের আর মাত্র একটি দিনের। মীর্জাগঞ্জের মাদ্রাসা কেন্দ্রের বৃহস্পতিবারের এই তথ্যটি শুক্রবার দিনই পত্র-পত্রিকায় এসেছে।

কোন বিশেষ স্থান বা বিশেষ কেন্দ্র অথবা কোন বিশেষ পরীক্ষা নয়, রাজধানীর বাইরের ফাইনাল পরীক্ষাগুলোর অবস্থা মোটামুটিভাবে একই। দুই বস্তা কেন, প্রতিদিনই নকলের বস্তা সংখ্যা হাজারও ছাড়িয়ে যাবে, যদি প্রতিটি সেন্টারে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশী নিয়মিত করা হয়। এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তার রেকর্ড রাখা হয়। নকল ছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্র মফস্বল শহরগুলোতে, যেন অকল্পনীয়। ছোটখাট টুকিটাকি নকল, খাতা দেখাদেখি, পারস্পরিক খালাপ আলোচনা—এসব এখন রেওয়াজে পরিণত, শুধু বইপত্র কাগজটাগজ সঙ্গে রাখলেই তা চোখে লাগে আর 'নকল' খেতাব পায়।

সকল ক্ষেত্রে কি এই পীড়নটুকুও হয়? শিরের না হয়ে অন্তত মনের? তাহলে কেন এক যাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন ফল পরিলক্ষিত? কোথাও নকলে ধরা পড়লে মৌখিক ওয়ার্নিং কোথাও উত্তরপত্র খানিক আটকে রাখা, কোথাও নকলের কল্যাণে লিখিত অংশটি কেটে দেয়া, কোথাও সাধারণভাবে কিছু নম্বর কাটা, কোথাও বহিষ্কার করা, কোথাও কঠিন রিপোর্ট তৈরি করে হল থেকে বিতাড়িত করে একাধিক বছর পরীক্ষা দিতে না-পারার ব্যবস্থা করা।

পরীক্ষার পরিবেশেও পরিদৃষ্ট বিভিন্নতা। সকল পরীক্ষার কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা এক রকম নয়। কোথাও বন্ধ অর্গল, ফটকের ত্রি-সীমানায় পদচারণা বারণ; কোথাও অবারিত দ্বার, পরীক্ষার হল অবাধ পরীক্ষার্থীর অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের চলাফেরায় গুলজার। কোথাও ঘাড়-ঘোরানো পর্যন্ত নিষিদ্ধ, কোথাও ঘনঘন 'বাথরুম', পিওন কর্তৃক বার বার 'পানি' বা 'ভাব' সেবন সিদ্ধ।

নকলের ফলাফলে ও পরিবেশে এই যে ব্যবধান, তা-ই প্রমাণ করে নকল করার সুযোগ আমাদেরই অবদান। আমরা চাইলে নকল ছাড়া পরীক্ষা হতে পারে, হয়। যেমন এই রাজধানীর অধিকাংশ কেন্দ্র। এই সকল কেন্দ্রের পরিবেশের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য 'পরীক্ষা' সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদেরই মনে সমীহ ভাব জাগায়; পরিদর্শক, অভিভাবক, ইনভিজিলেটর সকলের মধ্যেই প্রশান্তি এনে দেয়। আর রাজধানীর বাইরের পরীক্ষা হলের কলকাকলি, অবাধ-আচরণ 'পরীক্ষাকে খেলো করে তোলে—সর্বসাধারণের মধ্যে অনাস্থার সৃষ্টি করে। আর শিক্ষাবঞ্চিত ও শিক্ষিত উভয় শ্রেণীর মধ্যে নিস্পৃহতার সৃষ্টি করে। শিক্ষাকে মর্যাদাহীন করার জন্য এর চেয়ে বড় হাতিয়ার আর কিছু নেই।

ঘুরে-ফিরে সেই একই প্রশ্নে আসতে হয়—কেন মূল শহর বা এই মেট্রোসিটিতে নকল হয় না আর সবখানে হয়? বলা হয়, শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তারা দূর দূরে অঞ্চলে পৌঁছুতে পারেন না, পথঘাট-সমস্যা অথবা সময়ের সংকট কিংবা সর্বত্র সমান সংখ্যক দায়িত্বশালী ব্যক্তিত্ব পাঠানোর মতন অফিসারের স্বল্পতা। তাহলে জিজ্ঞাস্য, নকল প্রতিরোধ কি মাত্রই বোর্ডগুলোর দায়িত্ব? এ কর্তব্য প্রশাসনের আর কোনও স্তরে নেই? থাকতে নেই স্থানীয় জনগণের মধ্যে? সেই জনগণ যাঁরা কেউকেটা, যাঁরা সমাজের মাথা, যাঁরা সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল পদে আসীন, তাঁদের হাতে? প্রশাসনের সর্বত্র এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের সর্বশ্রেণী যদি নকল প্রতিহত করতে চান, তবে নকল চলতে পারে কী করে, এ প্রশ্ন যদি তোলা হয়, তা কি অন্যায়?

তাই জিজ্ঞাসা উঠছে—আসলে কী চাই আমরা? পরীক্ষায় পাস হওয়া? নাকি শিক্ষা, প্রকৃত শিক্ষা? জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার ও সচেতন নাগরিক গড়ে তোলা? জবাবটি খোলা মনের হওয়া ভালো, মুখে এক, কাজে আর হলে চলবে না।

শহর ও গ্রাম, রাজধানী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বৈষম্য সর্বজনবিদিত। সুযোগ-সুবিধার তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে তারতম্য ঘটছে লক্ষ্যে আদর্শেও। রাজধানীর বাইরে সেখানে পরীক্ষার্থীর লক্ষ্য উত্তীর্ণ-হওয়া অথবা 'বিভাগ' পাওয়া, বড়জোর তারা লাভ করা—রাজধানীর লক্ষ্যমাত্রা সেখানে মেধাস্থান অধিকার করা। তাই রাজধানীর বাইরের 'নকল' প্রত্যক্ষ, আর রাজধানীর কৌশল' অলক্ষ্য।

এ দু ধরনের প্রতিযোগিতা সর্বনাশ ডেকে আনছে, নাশ করে দিচ্ছে সব সুন্দরকে, ধস নামাচ্ছে মূল্যবোধে। প্রাপ্তিটাই বড় বেশি মুখ্য বলে পদ্ধতিটা গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিবেক বিসর্জন দেয়া সহজ হচ্ছে, চোখের পর্দার অপসারণ সম্ভব হতে পারছে।

যেকোনও পর্যায়েরই যেকোনও চূড়ান্ত পরীক্ষা যখন শুরু হয়, তৎক্ষণাৎ নকলের দৌরাত্ম্য সংবাদের শিরোনাম হয়। প্রতিবাদ হয়, প্রতিকার প্রার্থনা হয়, তারপর পরীক্ষা শেষে সব চুকে যায়। প্রতিবিধান হয়, অন্যভাবে। যেমন কেন্দ্র বাতিল করা (বাতিল করে রাখা যায় না অবশ্য) আকস্মিক পরিদর্শনে সামনে যে পড়ে, তাকেই এক্সপেলড করা। কোনও কোনও সংবাদে নকল সংক্রান্ত চমকপ্রদ তথ্য পরিবেশন করে নকলের প্রসার সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা। এছাড়াও আরও প্রতিষেধক নেয়ার ব্যবস্থা হয়, যেমন খাতায় লেখা থাকলেও নকল করা হয়েছে ধরে নিয়ে নম্বর বেশি না দেয়া। ঢাকার খাতা বাইরে না পাঠানো, গ্রেস একেবারেই না দেয়া, বোর্ডে যে ডিভিসনই পাক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে ফের ভর্তি পরীক্ষা নেয়া।

এসব যে প্রতিকার নয়, প্রহসন মাত্র—এ জানা কথা। উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে দেয়া তো হয়ই এর ফলে, এছাড়া অংশবিশেষের জন্য সকলকে নাজেহাল করার আশংকাও থাকে। মাত্র একজনও যদি নকল না করে, তাহলে সেই নিরপরাধ পরীক্ষার্থীও পড়ে এমন ঢালাও বিচারের যাঁতাকলে।

আসলে মলম লাগবে মূল ক্ষতস্থানে। আগে ঠিক করা উচিত, আমরা কি নকল চাই? যদি এর অবসান চাই, তাহলে তা কোন পথে, কিভাবে? এলাকাবিশেষ বিশোধিত রেখে, এ বিশোধনেরও নানান পরোক্ষ প্রশ্ন আছে। বাদবাকি সব এলাকাকে উচ্ছন্নে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর পন্থা কি হতে পারে। পথ, পন্থা, পদ্ধতি—যাই হোক, তা যদি আন্তরিক, সঠিক ও সর্বত্র সমান প্রযোজ্য হয়, তবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাধ্য হতে পারে না নকলে অবিচল থাকার। আমাদের চাওয়া তখনি সৎ হবে যখন আমাদের লক্ষ্য সৎ হবে।

তবে কোথাও শৈথিল্য, কোথাও কাঠিন্য—এ দুই ধরনের নীতি বর্জন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। আমরা কিশোর তরুণদের হাতে অসহায় নই। তাদের মনমানসিকতা চরিত্র আদর্শ গঠনের পূর্ণ দায় আমাদের। বৃহত্তর সমাজের ছায়া তাদের মধ্যে পড়তে পারে সত্য, কিন্তু এতো অল্প বয়সেই তাঁদের অত দিব্য জ্ঞানী ভাবতে বলা ভুল হবে। যারা নকল করে, তাদের পেছনে আমাদেরই কারু না কারু সমর্থন আছে; আছে সহযোগিতাও। এ মিথ্যে নয়। এমনিতেই হবে। অপ্রিয় সত্য না মেনে নিলে অশুভকে হটানো যাবে না। নকলের পরীক্ষার্থীকে চরম ক্ষতি বা অবমান নায় না ফেলে তাদের সঙ্গের সমাজের 'শক্তি'কে বা 'উৎস'কে টেনে বের করে তাদের চিহ্নিত করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা পরীক্ষা-কেন্দ্রে ব্যর্থ হয়ে পরবর্তী পর্যায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ভাব বা ভাবনা পরিত্যাগ করতে হবে।

এতে দুটো বড় লোকসান হতে পারে, এক—একের জন্য অন্যরা অথবা অন্যদের জন্য একজন খামোখাই ঢালাও শাস্তির আওতায় আসতে পারে; দুই—ব্যাপারটি হাতে মারতে না পেরে ভাতে মারার শামিল হয়ে দাঁড়াবে।

এর ফলে কোমল অনভিজ্ঞ কিশোর তরুণদের বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা দুই-ই নষ্ট হবে। পথে আনতে গিয়ে উল্টো পথভ্রষ্ট করা হবে যার মাসুল দিতে হবে জাতিকে বড় করুণভাবে।

—হোসনে আরা শাহেদ